পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S. (Glasgow)

পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোস্কপিক সার্জন

প্রফেসর অফ সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা-বাংলাদেশ

প্রকাশিকা
শামসুন নাহার
রহমান প্রকাশনী
৩৬৫ নিউ.ডিওএইচ.এস
মহাখালী
রোড নং ২৮ (৪র্থ তলা)
ঢাকা-বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
প্রথম মুদ্রণ : ০৫-১০-১৯৯৭ ইং
২য় সংস্করণ : ১২-০৫-২০০০ ইং
৩য় সংস্করণ : ০১-০৮-২০০১ ইং
৪র্থ সংস্করণ : ০১-০৫-২০০৩ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ
তাসনিয়া কম্পিউটার
৪৯১/১. ওয়ারলেছ রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন : ০১৭১-৪০৭৯৪৩
E-mail : mhhannan@yahoo.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই
দেশ প্রিন্টার্স
১০ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন
প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন :৭১১১২৭২
০১৭১-৬৭৫৫৫১

মূল্য ১৫·০০ টাকা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

১. ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম ৩
২ পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ
- আল-কুরআন ৬
- আল-হাদীস ৭
- বিবেক-বুদ্ধি ৮

৩. আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্ব
- দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ ১৪
- আখিরাতের দৃষ্টিকোণ ১৪

৪. বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অসতর্ক ধারণাসমূহ ১৫
৫. মানুষের জীবনের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগ ১৬
৬ মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবেক-বুদ্ধির তথ্যসমূহ ১৭
৭. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল-কুরআনের তথ্যসমূহ ২০
৮. আল্লাহর দৃষ্টিতে ন্যায়-অন্যায় কাজগুলো কি কি তা জানার উপায় ৩২
৯. ন্যায়-অন্যায় কাজগুলোর দু'চারটা করলে চলবে না সবগুলো করতে হবে ৩৩
১০. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হাদীসের তথ্যসমূহ ৩৬
১১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইসলামের চূড়ান্ত রায় ৪৩
১২. উপাসনামূলক কাজগুলোর গুরুত্ব ৪৩
১৩. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ৪৪
১৪. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চলমান চিত্র (Flow Chart) ৪৫
১৫. শেষ কথা ৪৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারী বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার ।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলমান ও অমুসলমানদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজী ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটা (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটা কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে?' তখন এ প্রশ্নের আমি কি জবাব দিব?

এ উপলব্ধিটা আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই সেখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারী বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটা লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো জানার পর আমি অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণা-এ দুয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ব বোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِه ثَمَنًا قَلِيْلاً اُوْلٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلاَّ النَّارَ وَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

তরজমা : 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং তার বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা পেট আগুন দিয়ে ভরল। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ বলছেন, আমি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছি, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় (অর্থাৎ সামান্য অর্থ, সুযোগ-সুবিধা বা খ্যাতি ইত্যাদি পায়), তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটা একটা সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনে কি লেখা আছে তা জানার পর এবং কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২ নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِه ـ

তরজমা : ইহা (আল-কুরআন) একটা কিতাব। এটা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়, ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারীর অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দেয়া। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হওয়া। এ অবস্থাটা খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য় টাকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটা বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের দুরবস্থার একটা প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সঃ) মাধ্যমে মুসলমানদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশীয়াহ : ২২, নিসা : ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সঃ) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোন একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে, তারা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে এবং তাদেরকেই তুমি সংগঠিত করবে। আর যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে (কারণ, কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা হচ্ছে হাদীস) কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করলাম। হাদীস বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ১০.৪.৯৯ ইং তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিয়া' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাদের প্রতিদান দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (সঃ) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটা সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটাকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন—এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের মূল উৎস তিনটি– আল-কুরআন, আল-হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি মূল উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটি যথাযথ ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ–

ক. আল্-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল্-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) এর পর আর কোন নবী-রাসূল (সঃ) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল্-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সঃ) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সঃ) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রকার স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করা এবং তারপর চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক একটা আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে

তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, তথা বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নাহলের ৫২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে বিপরীতধর্মী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. আল-হাদীস

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সঃ)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তাই, সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সঃ) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সঃ) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন– যেগুলো কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুসঙ্গিক বিষয়। হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণনাকারী সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন—

وَ نَفْسٍ وَّ مَا سَوّٰهَا - فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰهَا -

অর্থ : শপথ মানুষের জীবনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে পাপ কাজ ও সৎ কাজ বুঝার ক্ষমতা (বা পাপ কাজ ও সৎ কাজের প্রতি ঝোঁক প্রবণতা) দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা : ৮ নং আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষকে তিনি জন্মগতভাবে কোনটি পাপ কাজ ও কোনটি সৎ কাজ অর্থাৎ কোনটি ন্যায় ও কোনটি অন্যায়, তা বুঝার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্মগত এই ক্ষমতাকেই বিবেক বলা হয়।

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সঃ)-এর বক্তব্য হচ্ছে—

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلاَمُ لِوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَه وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَئَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِىْ)

অর্থ : রাসূল (সঃ) ওয়াবেছা (রাঃ)কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো : হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফ্স ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন : যে বিষয়ে তোমার নফ্স ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়। (তিরমিজি, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা : হাদীসখানিতে রাসূল (সঃ) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ। তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা

চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلٌ বলা হয়েছে। এই عَقْلٌ শব্দটিকে আল্লাহ

اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ -

ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানতঃ ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে—

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ -

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ -

অর্থ : যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَ قَالُوْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ -

অর্থ : জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত

যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সঃ) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল–

১. হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, নবী করিম (সঃ) ১০ই জিলহজ্জ কুরবানীর দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম)।

   হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা' পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'। (তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকী)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন। কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে।

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমনই তাতে সময়ও লাগে খুব কম।

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা মনের প্রশান্তি নিয়ে তার উপর আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়।

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

খ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি–

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সঃ) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বুরাক নামক রকেটে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক রকেটে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (সঃ)কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে। আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer Disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental Step) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological Development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের

তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারির শক্তি অথবা বন্দুক বা কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic Energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা যে সকল বিষয়ে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য অস্পষ্ট সে সকল বিষয়ে মূল উৎস তিনটির আলোকে অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস বলে। কিয়াসকারীকে কুরআন ও হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রের জ্ঞানে যেমন পারদর্শী হতে হয় তেমনি তার বিবেক-বুদ্ধিও প্রখর ও সমুন্নত থাকতে হয়।

আর কোন বিষয়ে সকল বিশেষজ্ঞের কিয়াসের ফলাফল যদি একই হয়, তবে ঐ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলা হয়। ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে। তাই সহজেই বুঝা যায়, কিয়াস ও ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের তথ্যের কোন মূল উৎস নয়।

এই পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াসের কোন সুযোগ নেই।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ক্রমধারাটি মহান আল্লাহ্ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সঃ) ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ক্রমধারাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ক্রমধারাটি (Flow Chart) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'কোন বিষয়ের সঠিকত্ব যাচাই এবং বক্তব্য উপস্থাপনের নীতিমালায় কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ইসলাম-সম্মত ক্রমধারা (বর্ণনা ও চিত্রগত)' নামক বইটিতে। তবে ক্রমধারার চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল—

যে কোনভাবে জ্ঞানের আওতায় আসা বিষয়ের সঠিকত্ব যাচাইয়ের নীতিমালায় কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ইসলাম-সম্মত ক্রমধারার চলমান চিত্র (Flow chart)

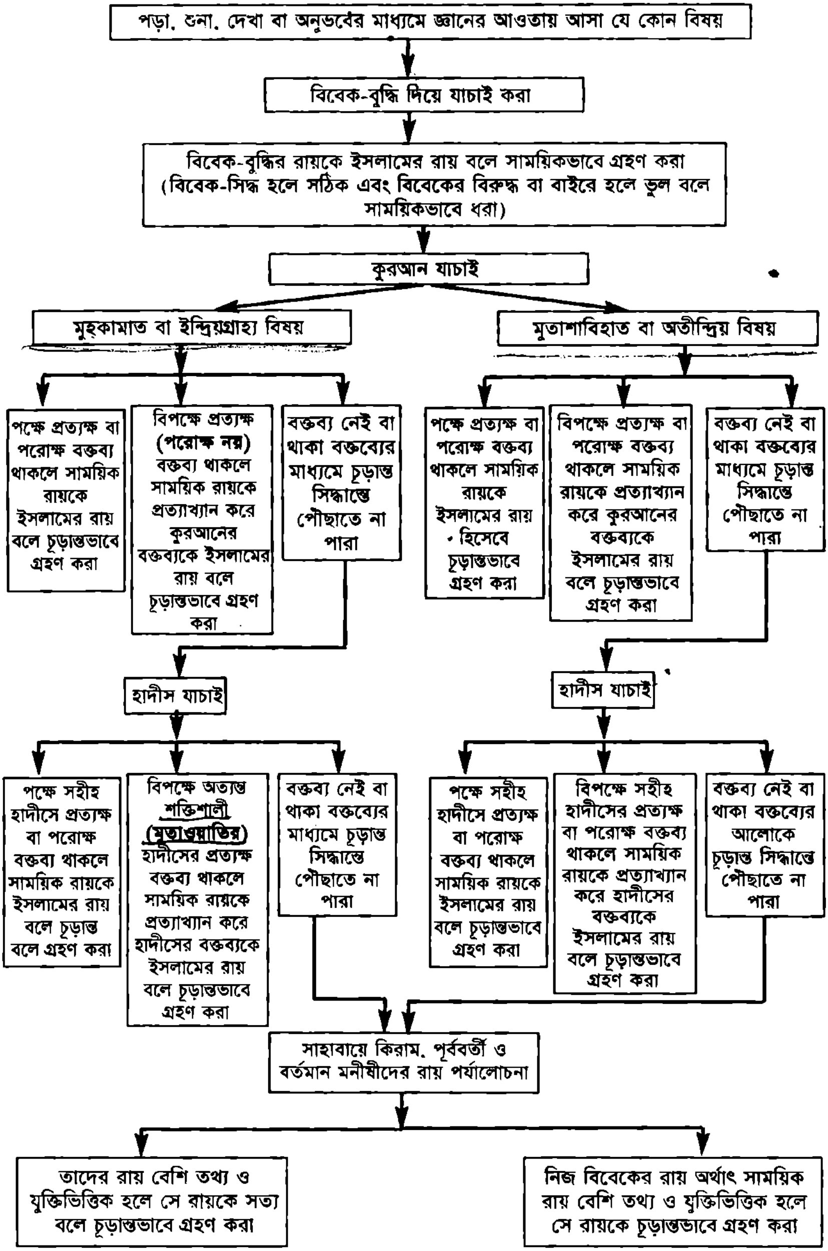

মূল বিষয়

আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্ব

সুধী পাঠক, প্রথমে চলুন পর্যালোচনা করা যাক আলোচ্য বিষয়টি মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের জন্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ

কোন জিনিস ব্যবহার করে দুনিয়ায় কল্যাণ পেতে হলে ঐ জিনিসটি তার প্রস্তুতকারক যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে তা ব্যবহার করতে হয়। এটা একটা চির সত্য (Universal Truth) কথা।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে। ধরুন, একটা রেডিও। এই রেডিও থেকে কল্যাণ বা উপকার পেতে হলে সর্ব প্রথম জানতে হবে, রেডিওটা কি উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। তারপর সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রেডিওটি ব্যবহার করতে হবে। রেডিও বানানো হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষ রেডিওর দ্বারা বিভিন্ন রেডিও সেন্টারের অনুষ্ঠান শুনবে এবং তা থেকে বিভিন্নভাবে উপকৃত হবে। এখন মানুষ যদি রেডিওকে তার প্রস্তুতকারকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার না করে দেখার বস্তু হিসেবে ঘরের কোণে রেখে দেয়, তাহলে এর দ্বারা মানুষের কোন কল্যাণ হবে না।

আল্লাহও অনুরূপভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। মানুষ যদি তার শরীর, মন ও জীবন ব্যবহার করে দুনিয়ায় কল্যাণ পেতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার সেই উদ্দেশ্যকে প্রথমে জানতে ও বুঝতে হবে এবং তারপর তার জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করতে হবে সেই উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে।

আর মানুষ যদি তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সেই উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে তাদের শরীর, মন ও জীবনকে ব্যবহার করে তবে দুনিয়াতে তাদের অবশ্যই ভোগ করতে হবে নানা অশান্তি ও অকল্যাণ।

আখিরাতের দৃষ্টিকোণ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা ছোয়াদের ২৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে—

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ج ذَالِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ـ

অর্থ : মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এ উভয়ের মধ্যে থাকা কোন কিছুই আমি বিনা

উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। এটা কাফের লোকদের ধারণা। আর ঐ ধরনের কাফের লোকদের জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হওয়া অনিবার্য।

ব্যাখ্যা : আল-কুরআনের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটির মাধ্যমে যে তথ্যগুলো মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন তা হচ্ছে–

- ❑ মহাকাশ, পৃথিবী এবং এ উভয়ের মধ্যে থাকা সকল কিছু অর্থাৎ মানুষ, পশু-পক্ষী, গাছপালা, নদীনালা, কুরআন, নামাজ, রোজা, হজ্জ ইত্যাদির প্রত্যেকটি সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে তার একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে।
- ❑ যারা মনে করে বা ধারণা করে, ঐ সকল কিছুর কোন একটিও মহান আল্লাহ বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তারা কাফের।
- ❑ পরকালে ঐ কাফেরদের ঠিকানা হবে দোযখ।

মহান আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষ, পশু-পক্ষী, গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, খাবার-দাবার, কুরআন, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যে সকল জিনিস বা বিষয় মহাকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আছে, তার কোন কিছুকে তিনি বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন– এটা যারা মনে করবে বা ধারণা করবে, তারা কাফের এবং তাদের ঠিকানা হবে দোযখ। তাহলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, যারা ঐ ধারণাকে বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে, ঐ সকল জিনিস বা বিষয়ের কোন একটিকেও এমনভাবে ব্যবহার বা আমল করবে, যাতে ঐ জিনিস বা বিষয়টি সৃষ্টি বা প্রণয়নের পেছনে থাকা আল্লাহর উদ্দেশ্যটি সাধন হয় না বা সে উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে তা কোন ভূমিকা রাখে না, তবে সে ব্যক্তি বা সে ব্যক্তিদেরও আল্লাহর নিকট কাফের হিসেবে গণ্য হতে হবে এবং তাদের ঠিকানা হবে আরো নিম্ন স্তরের দোযখ।

বর্তমান বিশ্বের মুসলমান তথা মানুষের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অধিকাংশেরই আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে তাদের এবং কি উদ্দেশ্যে কুরআন, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, পশু-পক্ষী, খাবার-দাবার, নদীনালা ইত্যাদি সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন, সে ব্যাপারে সঠিক ধারণা নেই। তাই তারা তাদের জীবন ও অন্যান্য জিনিস বা বিষয় এমনভাবে ব্যবহার বা আমল করছেন যে, ঐ সকল জিনিস বা বিষয় সৃষ্টি বা প্রণয়ন করার পেছনে থাকা আল্লাহর উদ্দেশ্যগুলো সাধিত হচ্ছে না। তাই পরকালে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের অবস্থা কি হবে, তা ভেবে চিন্তাশীল ও দরদী সকলেরই ঘুম হারাম হয়ে যাওয়ার কথা।

আমার এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন তা পর্যালোচনা করা এবং সে পর্যালোচনার ফলাফল মানুষকে জানানো। যাতে তারা সৃষ্টির সেই উদ্দেশ্য সাধনকে সামনে রেখে তাদের জীবনকে পরিচালনা করে দুনিয়ায় শান্তি পায় এবং আখিরাতে কামিয়াব হয়।

বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অসতর্ক ধারণা

বর্তমান বিশ্বের মুসলমান সমাজে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চালু থাকা ধারণাসমূহ–

১. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাস্‌বিহ-তাহলিল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজগুলো করার জন্যে— বেশির ভাগ মুসলমানের মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এটাই হচ্ছে ধারণা।

২. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদত বা দাসত্ব করার জন্যে। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্বমূলক সকল কাজই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য— এ ধারণাটাও অনেক মুসলমানের মধ্যে বিদ্যমান।

৩. মানুষকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর খলিফা হিসেবে জীবন-যাপন করা। অর্থাৎ আল্লাহর খলিফা হিসেবে করা সকল কাজই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য— এ ধারণাটাও অনেকে পোষণ করেন।

সুধী পাঠক, চলুন আমরা কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের মাধ্যমে যাচাই করে দেখি, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের ঐ ধারণাসমূহের কোনটিই ঠিক কিনা। আর ঠিক না হলে প্রকৃতভাবে মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যটি কি?

মানুষের জীবনের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগ

চলুন, আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সহজে বুঝার জন্যে প্রথমে মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেয়া যাক-

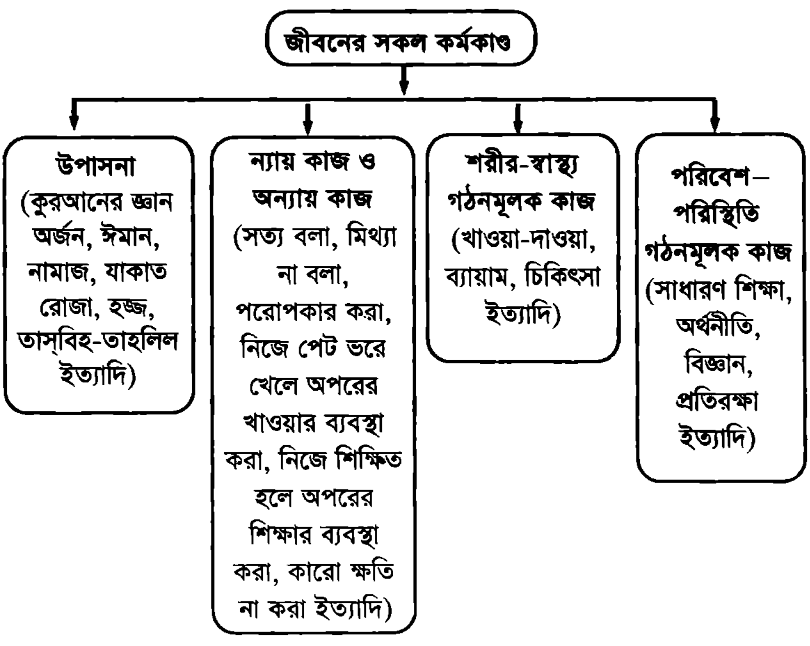

এখন চলুন, আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যগুলো পর্যালোচনা করা যাক।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবেক-বুদ্ধির তথ্যসমূহ

তথ্য-১

কোন বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সকল বিষয় সম্পর্ক যুক্ত থাকে, তার একটি বা এক বিশেষ গ্রুপ হয় ঐ বস্তু বা বিষয় সৃষ্টি বা প্রণয়নের উদ্দেশ্য। আর বাকি সব হয় তার পাথেয় অর্থাৎ উদ্দেশ্যটি সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় বা সহায়ক বিষয়। দু'টি উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে আশা করি।

উদাহরণ- ১

একটি কলমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বস্তু বা বিষয়গুলো হচ্ছে লেখা, কালি, কাগজ, কলমের নিব ও শরীর, কলম ও কালি তৈরির কারখানা। এর মধ্যে লেখাটা হচ্ছে কলম তৈরির উদ্দেশ্য। আর বাকি সবগুলো হচ্ছে পাথেয়। অর্থাৎ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তু বা বিষয়সমূহ।

উদাহরণ- ২

ডাক্তারী বিজ্ঞানের (Medical Science) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়সমূহ হচ্ছে- চিকিৎসা করা, ডাক্তার, নার্স, মেডিকেল কলেজ, হাসপাতাল, ঔষধ, মেডিকেল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এর মধ্যে চিকিৎসা করা হচ্ছে ডাক্তারী বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য আর বাকি সব হচ্ছে তার পাথেয়।

মানুষের জীবনের সঙ্গেও নানা ধরনের বিষয় সম্পর্কযুক্ত এবং ঐ বিষয়গুলোকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা যায়। যথা– উপাসনামূলক কাজ, ন্যায়-অন্যায় কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ এবং পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ। তাহলে বিবেক-বুদ্ধির রায় অনুযায়ী ঐ ৪ গ্রুপের মধ্যে এক গ্রুপের কাজই হবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর বাকি সবগুলো হবে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়।

তথ্য-২

কোন সৃষ্টিকারক যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে একটি জিনিস সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেন, তখন ঐ জিনিসের গঠনটি তিনি এমনভাবে করেন যেন ঐ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তা সরাসরি ও সুনির্দিষ্টভাবে সহায়ক হয়। এটাও একটা চির সত্য (Universal Truth) কথা। নিষ্প্রাণ জিনিসের বেলায় সেই গঠন হয় শুধু শারীরিক। আর সপ্রাণ জিনিসের বেলায় সেই গঠন হয় শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক। অর্থাৎ একটা সপ্রাণ সৃষ্টির–

ক. বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন হবে এমন যেন সে জন্মগতভাবে (কোন পড়াশুনা বা শিক্ষাদীক্ষা ছাড়াই) বুঝতে পারে, কোন বিষয়টি বা বিষয়গুলো তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। তা না হলে যে প্রাণীদের পড়াশুনা বা শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা নেই তারাতো বুঝতে বা জানতে পারবে না, তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি। আবার যে মানুষটির শিক্ষার সুযোগ হয়নি বা যেখানে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ নেই, সেখানকার মানুষ তো বুঝতে পারবে না তার বা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি। তাছাড়া অন্য মানুষের (নবী-রাসূল বাদে) নিকট থেকে শিখতে হলে তারা সৃষ্টির উদ্দেশ্যটা সঠিকভাবে শিখাচ্ছেন কিনা, সে ব্যাপারে সন্দেহ সব সময়ই থাকবে।

খ. শারীরিক গঠন হবে এমন যেন সেই গঠন ঐ প্রাণীকে তার উদ্দেশ্য সাধনের পথে সরাসরিভাবে সহায়ক হয়। কারণ, তা না হলেও তার জন্যে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করা দুষ্কর বা অসম্ভব হবে।

মানুষ সৃষ্টি করতে পারে শুধু নিষ্প্রাণ জিনিস বা বস্তু। এই চির সত্য কথা অনুযায়ী তাই দেখা যায়, মানুষের সৃষ্টি করা প্রতিটি বস্তুর শারীরিক গঠন ব্যতিক্রম ছাড়াই এমন হয় যে তা, সরাসরিভাবে তার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়। উদাহরণস্বরূপ একটা ছুরিকে ধরা যায়। ছুরি সৃষ্টি বা বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন কিছু কাটা। তাই সকল ছুরির প্রস্তুতকারক ছুরির শারীরিক গঠন অবশ্যই এমন করেন যেন, তা দিয়ে সহজেই কোন কিছু কাটা যায়।

মানুষসহ অন্য সকল সপ্রাণ জীবের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন মহান আল্লাহ। মানুষ সৃষ্টি করার সময় সব সৃষ্টিকারকের বড় সেই সৃষ্টিকারকেরও এই চিরসত্য বিষয়টি অনুসরণ না করার কথা নয়। অর্থাৎ মহান আল্লাহরও মানুষকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সাধনের জন্যে—

ক. এমন বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন দেয়ার কথা যাতে সে জন্মগতভাবে বা অন্য কোন অদৃশ্য উপায়ে (ইলহাম) নিজ থেকেই বুঝতে পারে কোন্ কাজগুলো বা বিষয়গুলো তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

খ. এমন শারীরিক গঠন দেয়ার কথা যেন সেই শারীরিক গঠন তাকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য মূলক কাজগুলো করার জন্যে সরাসরিভাবে সহায়ক হয়।

তবে মহান আল্লাহ মানুষকে তা দিয়েছেন কিনা তা আমরা নিশ্চিতভাবে শুধু জানতে পারব কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে। আর কুরআন ও সুন্নাহে এমন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমেই (নাহল : ৮৯) জানিয়ে দিয়েছেন, ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয় তিনি কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আর রাসূল (সঃ)-এর প্রধান কাজ ছিল, কুরআনের বক্তব্যগুলো কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেয়া।

কুরআন ও সুন্নাহে এ তথ্যটা দু'ভাবে থাকতে পারে বা সেখান থেকে এ তথ্যটা দু'ভাবে বুঝে নেয়া যেতে পারে। যথা–

১. কুরআন ও সুন্নাহে সরাসরিভাবে বলা থাকতে পারে আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে বা অন্য কোন অদৃশ্য উপায়ে নিজ থেকেই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক কাজ বা বিষয় কোনগুলো, তা বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তার শারীরিক গঠনও এমন দিয়েছেন যা তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সরাসরিভাবে সহায়ক হবে।

২. কুরআন ও সুন্নাহের বক্তব্য থেকে যদি বুঝা যায় যে, মানুষকে জন্মগতভাবে বা অন্য কোন অদৃশ্য উপায়ে শুধু তাদের জীবনের কিছু কিছু বিষয় বুঝার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তবে বুঝতে হবে, ঐ বিষয়গুলোই হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আবার যদি সেখানে বলা থাকে যে, মানুষকে আল্লাহ সঠিক শারীরিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন, তবে বুঝতে হবে, যে শারীরিক গঠন তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সরাসরিভাবে সহায়ক হবে মানুষকে সেই শারীরিক গঠনই দেয়া হয়েছে। তা না হলে আল্লাহ ঐ গঠনকে 'সঠিক গঠন' বলতেন না।

তথ্য-৩

মহান আল্লাহ নিজকে 'রহমান' ও 'রহিম' (দয়ালু ও করুণাময়) অর্থাৎ মানুষের সবচেয়ে বেশি কল্যাণ কামনাকারী সত্তা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। যে সত্তা মানুষের সর্বাপেক্ষা বেশি কল্যাণ কামনাকারী, বিবেক-বুদ্ধির ১০০% সিদ্ধ রায় হচ্ছে, তার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কখনও এটা হতে পারে না যে, তার সৃষ্টি করা মানুষ নানা ধরনের অন্যায়-অত্যাচার, অবিচারে ডুবে আছে বা তারা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার অভাবে মানবেতর জীবন-যাপন করছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একজন মানুষ নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাস্‌বীহ-তাহলীল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজগুলো নিয়ে মশগুল থাকবে।

বরং বিবেক-বুদ্ধির ১০০% সিদ্ধ রায় হচ্ছে, মানুষের সবচেয়ে বেশি কল্যাণ কামনাকারী সত্তার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হওয়ার কথা মানুষ যাতে সকল অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, নির্যাতন ও শোষণ মুক্ত থেকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদিসহ সুখে, শান্তিতে ও প্রগতিশীলভাবে জীবন-যাপন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হওয়ার কথা 'ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ'।

তথ্য-৪

যে কাজ বা বিষয় থেকে কোন শিক্ষা দেয়া হয় বা যে কাজ কোন শিক্ষা দেয়ার জন্যে প্রণয়ন করা হয় অথবা যে কাজ বা বিষয় মানুষের মন, বুদ্ধিবৃত্তি, শরীর বা

পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনের জন্যে করা হয় বা করতে বলা হয়, সে কাজ কখনও উদ্দেশ্যমূলক কাজ হয় না। তা হয় পাথেয়মূলক কাজ। কারণ, ঐ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে বা ঐ গঠন করা হচ্ছে কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। যেমন–

ক. চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্যে মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেলের বই অপরিহার্য। কিন্তু এ দুটি বিষয় প্রয়োজন মেডিকেলের ছাত্রদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে। তাই মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেলের বই হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাথেয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের রোগ নিরাময় করা অর্থাৎ চিকিৎসা করা।

খ. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশকে প্রতিরক্ষা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সৈন্যদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে যে ট্রেনিং (Training) দেয়া হয়, সেই ট্রেনিং হচ্ছে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাথেয়।

তাই মহান আল্লাহ কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে যদি জানিয়ে দিয়ে থাকেন যে, কিছু কিছু কাজ তিনি প্রণয়ন কবেছেন ও করতে বলেছেন তা থেকে মানুষকে কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্যে, তবে সে কাজগুলো হবে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়মূলক কাজ, উদ্দেশ্যমূলক কাজ নয়।

তথ্য-৫

বিবেক-বুদ্ধির আর একটি চির সত্য (Universal Truth) রায় হচ্ছে, কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে উপযুক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে সে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী জনবল অবশ্যই আগে তৈরি করতে হয়। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত মানুষ বা জনবল তৈরি করার জন্যে নির্ভুল কর্মসূচিও কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে তাঁর জানিয়ে দেয়ার কথা।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল-কুরআনের তথ্যসমূহ

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনের তথ্য পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হলে দুটো বিষয়কে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে–

ক. আলোচ্য বিষয়ে আল-কুরআনে যতগুলো আয়াত আছে, তার সবগুলোর তরজমা ও ব্যাখ্যা পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সে পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হয় এবং বিরোধী না হয়। কারণ, আল-কুরআনের সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন কথা বা বক্তব্য নেই।

খ. পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ যে সমস্ত কথা বলেছেন, তার কিছু বলেছেন সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশে আর কিছু বলেছেন মুমিন বা মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে। যে কথাগুলো আল্লাহ্ সমগ্র মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, সেখানে যেমন মুসলমানরাও অন্তর্ভুক্ত তেমনই যে কথাগুলো তিনি মুমিন বা মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন সেগুলোয় মুসলমানরা বিশেষ লক্ষ্য হলেও সকল মানুষই তাতে অন্তর্ভুক্ত।

তথ্য-১

সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা ফেরেশতাদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দরভাবে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের জানিয়েছেন। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে, এ জন্যে ফেরেশতাদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে বিষয়টা তিনি উপস্থাপন করেছেন। আয়াতটি হচ্ছে—

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَ يَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতারা বললেন, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে পাঠাবেন যারা সেখানে ফেতনা, ফাসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তারক্তি করবে? অথচ আমরাতো সর্বদা আপনার তাস্‌বিহ্, হামদ্ ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। (বাকারা : ৩০)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করে প্রতিনিধি হিসেবে দুনিয়ায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেরেশতাদের যখন তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন, তখন ফেরেশতারা প্রশ্ন করলেন, 'তিনি কি দুনিয়ায় এমন জীব পাঠাতে যাচ্ছেন যারা সেখানে শয়তানি, মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি ইত্যাদি করবে? আর যদি তাসবিহ, হামদ ও পবিত্রতা বর্ণনা করা অর্থাৎ উপাসনামূলক কাজগুলো করার উদ্দেশ্যে তাদের সৃষ্টি করে থাকেন, তবে ঐ উপাসনামূলক কাজগুলো করার জন্যে তারাই কি যথেষ্ট নয়?' তখন আল্লাহ্ বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জান না'। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল্লাহ ফেরেশতাদের জানালেন, তোমরা যে দুটো কথা বললে, 'তার কোনটাই আমার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়'।

তাহলে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ এখানে দুটো বিষয়কে নাকচ করে দিয়েছেন। বিষয় দুটো হচ্ছে—

- ❑ মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি ইত্যাদি অকল্যাণমূলক কাজ।
- ❑ উপাসনামূলক কাজ। অর্থাৎ তাসবিহ্-তাহলিল, নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি।

মানুষের পক্ষে ফেরেশতাদের থেকে আল্লাহর বেশি উপাসনা করা অসম্ভব। আল্লাহ্ তাই এই আয়াতে ফেরেশতাদের সম্বোধন করে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, উপাসনা করার জন্যে আর এক সৃষ্টি আমার আছে, তাই তোমাদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য অন্য কিছু। কি সেই উদ্দেশ্যটি তা এই আয়াত থেকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝা না গেলেও পরোক্ষভাবে সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এখান থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হচ্ছে–

ক. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য উপাসনামূলক বিভাগের কাজগুলো নয়। তাহলে নিশ্চয়ই বাকি তিনটি বিভাগের বিষয়গুলোর কোন একটি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হবে।

খ. আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, বাকি তিন বিভাগের কাজগুলোর মধ্যে 'ন্যায় ও অন্যায়' বিভাগের, অন্যায় কাজগুলো তার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়। তাহলে ধরে নেয়া যায়, ঐ বিভাগের ন্যায় কাজগুলো অর্থাৎ 'ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' তাঁর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হবে।

তথ্য-২

وَ نَفْسٍ وَّ مَا سَوّٰهَا ، فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰاهَا ـ

অর্থ : শপথ মানুষের জীবনের এবং সেই সত্তার (আল্লাহর) যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার পাপকর্ম ও সৎ কর্ম তার প্রতি ইলহাম করেছেন। (আল-শামস:৭-৮)

ব্যাখ্যা : মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে এ দু'টি আয়াতে মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি তথ্য জানিয়ে দিয়েছেন। প্রথম আয়াতটিতে তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মানুষকে তিনি সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। কোন জিনিসের সঠিক গঠন বলতে বুঝায়, যে উদ্দেশ্যে ঐ জিনিসটি সৃষ্টি করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সাধনের জন্যে যে গঠনটি দরকার সেই গঠনকে। যেহেতু মানুষ একটি সপ্রাণ জীব, তাই মানুষের ব্যাপারে এই সঠিক গঠন বলতে বুঝাবে, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে (অর্থাৎ যে কাজ বা কাজসমূহ করার জন্যে) মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সাধন করার জন্যে যে শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন দরকার, সেই উভয় গঠনকে।

তাহলে আল্লাহ্ আলোচ্য প্রথম আয়াতটিতে বলেছেন, মানুষকে তিনি যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সহায়ক হয় জন্মগতভাবে এমন শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন তিনি তাকে দিয়েছেন। দ্বিতীয় (৮ নং) আয়াতটিতে আবার তিনি বলেছেন, মানুষের পাপ কর্ম ও সৎ কর্ম তার প্রতি 'ইলহাম' করেছেন।

ইলহাম শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন বিষয়কে মানুষের অন্তরে অবচেতনভাবে ঢুকিয়ে দেয়া। তাহলে আল্লাহ ৮ নং আয়াতটিতে বলেছেন, কোন্ কাজগুলো করা উচিত বা কল্যাণকর এবং কোন্ কাজগুলো করা উচিত নয় বা অকল্যাণকর তা মানুষের অন্তরে তিনি অবচেতনভাবেই ঢুকিয়ে বা জানিয়ে দেন। সহীহ হাদীসেও (পরে আসছে) উল্লেখ আছে যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন, অন্তর যেটার পক্ষে সায় দেয় বা অন্তর যেটা করে শান্তি পায়, সেটাই হচ্ছে সৎ কাজ বা নেক কাজ। আর অন্তর যার পক্ষে সায় দেয় না বা যা করে অশান্তি পায়, সেটাই হচ্ছে গুনাহের কাজ বা অন্যায় কাজ।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মানুষের জীবনের সকল কাজের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায় বিভাগে যে কাজগুলো আছে, শুধু সেগুলোই মানুষ জন্মগতভাবে বুঝতে পারে। আর অন্য তিন বিভাগের বিষয়গুলো জানার জন্যে কুরআন-হাদীস বা অন্যান্য গ্রন্থ অবশ্যই পড়তে হয় বা কারো নিকট থেকে তা জেনে নিতে হয়। যেমন—

ক. নামাজ, জাকাত, রোজা ও হজ্জ যে মানুষের করণীয় কাজ তা কুরআন-হাদীস না পড়লে বা কারো নিকট থেকে না শুনলে কেউই জানতে বা বুঝতে পারবে না।

খ. কোন রোগের কি লক্ষণ বা ঔষধ তা ডাক্তারী বিদ্যা না পড়লে বা কারো নিকট থেকে না শুনলে, কেউ বুঝতে পারবে না।

তাহলে এ আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবতাকে মিলালে দেখা যাচ্ছে, মহান আল্লাহ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে এমনভাবে গঠন করেছেন যে, তা জন্মগতভাবে মানুষের জীবনের বিভিন্ন বিভাগের কাজ বা বিষয়গুলোর মধ্যে ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলোকেই শুধু জানতে ও বুঝতে পারে। আর তাই আল-কুরআনে ন্যায় কথা বা কাজকে মারুফ (معروف) নাম দেয়া হয়েছে। মারুফ (معروف) শব্দটি এসেছে আরাফা (عرف) শব্দ থেকে। যার অর্থ হচ্ছে 'জানা'। অর্থাৎ মারুফ কথা বা কাজ হচ্ছে সেই কথা বা কাজ যা মানুষ জন্মগতভাবেই জানতে বা বুঝতে পারে।

বিবেক-বুদ্ধির ২ নং তথ্যে আমরা একটা চিরসত্য কথার থেকে সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, কুরআনের কোন বক্তব্য থেকে যদি জানা বা বুঝা যায় যে, জীবনের বিভিন্ন কাজের মধ্যে শুধু কিছু কিছু কাজকে আল্লাহ জন্মগতভাবে মানুষকে বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন, তবে বুঝতে হবে সে কাজগুলোই আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

তাই এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলোই হচ্ছে আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক কাজ। আর মানুষের জীবনের অন্য সকল বিভাগের কাজগুলো হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয়মূলক কাজ। অর্থাৎ 'ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধই' হচ্ছে মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানুষের শারীরিক গঠন যা দরকার ছিলো আল্লাহ সেই শারীরিক গঠনই তাকে দিয়েছেন। তাই তো মানুষের শারীরিক গঠনের সঙ্গে অন্য জীবের শারীরিক গঠনের কোন তুলনাই হয় না। আল্লাহও তাই বলেছেন, মানুষকে আমি সর্বোত্তম শারীরিক গঠনে সৃষ্টি করেছি। (তীন : ৪)

তাহলে আল কুরআনের ১ নং তথ্যের ন্যায় এ তথ্য থেকেও পরোক্ষভাবে জানা গেলো যে, 'ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধই' হচ্ছে মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর (নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ ইত্যাদি) উপাসনামূলক, শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক ও পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক সকল কাজ হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়। অর্থাৎ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে যোগ্য মানুষ গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ।

তথ্য-৩

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ -

অর্থ : 'তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি। মানব জাতির 'কল্যাণের' জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।' (আল-ইমরান : ১১০)

ব্যাখ্যা : দেখুন, কি অপূর্বভাবে আল্লাহ ছোট্ট একটা আয়াতের মাধ্যমে তাঁর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। আয়াতটি মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও তা সকল মানুষের জন্যেই প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, তোমরাই আমার শ্রেষ্ঠ উম্মত বা সৃষ্টি। তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে অর্থাৎ সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষ জাতির 'কল্যাণের' জন্যে। এরপর আল্লাহ বলে দিয়েছেন সেই কল্যাণ করার উপায়টা। আর তা হচ্ছে, ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ।

তারপর তিনি বলছেন, ঐ কাজ অর্থাৎ 'ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' করার সময় সর্বদা তাঁর প্রতি ঈমান রাখতে অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির দিকে সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে। সুধী পাঠক, কি অপূর্ব কথা– তাই না? ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ যদি নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে হয় বা নিজ জাতির স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে হয়, তবে তা কখনো সমগ্র মানব জাতির জন্যে কল্যাণকর হতে পারে না। বর্তমান বিশ্ব তার উদাহরণ। বর্তমান বিশ্বের শক্তিধর জাতিসমূহের ন্যায়নীতির মানদণ্ড তাদের দেশের মধ্যে একরকম এবং বাইরে অন্যরকম। তাই আল্লাহ বলছেন, এই ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের সময় সর্বদা আমার সন্তুষ্টিকে সামনে রাখবে অর্থাৎ আমি যেভাবে বলেছি সেভাবে করবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ নং ও ২ নং তথ্যে আল্লাহ পরোক্ষভাবে যে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন এই ৩ নং তথ্যে তা প্রত্যক্ষভাবে জানিয়েছেন। অতএব আল-কুরআনের এই তিনটি তথ্য থেকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এতটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা' হচ্ছে মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

পূর্বে বিবেক-বুদ্ধির ১ নং তথ্যের থেকে যে চিরসত্য কথাটি আমরা জেনেছিলাম, তা হচ্ছে কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়ের একটি বা একটি গ্রুপ হয় ঐ বিষয়ের উদ্দেশ্য। আর বাকি সবগুলো হয় তার পাথেয়। তাহলে এ আয়াত থেকেও পরোক্ষভাবে বুঝা যায় ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলো বাদে মানুষের জীবনের অন্য সকল কাজ হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়।

তথ্য-৪

আল-কুরআনের তথ্য থেকে জানা যায় যে, কুরআন অধ্যায়ন, ঈমান, নামাজ, রোজা, কুরবানী ইত্যাদি উপাসনামূলক ইবাদাত বা কাজগুলো থেকে মহান আল্লাহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়ে মানুষের মানসিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী গঠন করতে চেয়েছেন। যেমন–

ক. কুরআন অধ্যায়ন

কুরআন অধ্যায়ন বা পড়ার কথা বলতে যেয়ে আল্লাহ আল-কুরআনে যে তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হচ্ছে– কারাআত (قِرأَةٌ), তিলাওয়াত (تِلاَوةٌ), রাতালা (رَتَلَ)। ঐ তিনটি শব্দের প্রত্যেকটির আরবী ভাষাগত অর্থ হচ্ছে 'বুঝে বুঝে পড়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়া'।

খ. ঈমান আনা

ঈমান আনা আমলটির অর্থ হচ্ছে 'মুখে ঘোষণা দেয়া, অন্তরে বিশ্বাস করা (এবং বাস্তব কাজের মাধ্যমে তা প্রমাণ করা) যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে হুকুম বা আইন দেয়ার মালিক শুধুমাত্র আল্লাহ এবং সে হুকুম বা আইন বাস্তবায়ন করতে হবে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ) যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন সেভাবে'। অর্থাৎ ঈমান আনা আমলটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মন-মানসিকতাকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে গঠন করা।

গ. নামাজের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন–

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ط (বাকারা : ১৪৩)

অর্থ : পূর্বে তোমরা যে দিকে মুখ করে দাঁড়াতে, সেটাকে কেবলারূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম শুধু এটা বুঝে নেয়ার জন্যে যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে বিপরীত দিকে ফিরে যায়।

ব্যাখ্যা : মুসলমানদের কেবলা পরিবর্তনের আদেশ দেয়ার পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিলো আল্লাহ্ তা এই আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ দেখে নিতে চেয়েছিলেন, কে তাঁর আদেশ মানাকে অগ্রাধিকার দেয়। আর কে অন্য কিছুকে অর্থাৎ তাদের ধারণা, বিশ্বাস, রসম-রেওয়াজ (Tradition), লাভ-ক্ষতি ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দেয়। এখন থেকে বুঝা যায়, মুখ পশ্চিম দিকে করা, রুকু-সিজদা, কিয়াম-কিরাত ইত্যাদি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহ নামাজীকে কিছু শিক্ষা দিতে চান। আর সে শিক্ষার প্রধানটি হচ্ছে অন্য সকল কিছুকে (লাভ-ক্ষতি, রসম-রেওয়াজ, ধারণা-বিশ্বাস) উপেক্ষা করে আল্লাহর আদেশ মানাকে অগ্রাধিকার দেয়ার শিক্ষা।

ঘ. রোজা সম্বন্ধে কুরআনে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

অর্থ : হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোজাকে ফরজ করা হয়েছে যেমন তা ফরজ ছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (বাকারা : ১৮২)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্যে রোজা ফরজ করার কারণটি বলে দিয়েছেন। সে কারণ হচ্ছে তাকওয়া অর্জনের শিক্ষা দেয়া। রোজার সময় পানাহার ও বৈধ যৌন-মিলন নিষিদ্ধ। তাই আল্লাহ রোজার থেকে তাকওয়ার যে প্রধান শিক্ষাটি দিতে চান তা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট উপেক্ষা করে আল্লাহর আদেশ মানার শিক্ষা।

ঙ. কুরবানী সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন–

لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ط

অর্থ : ঐ গুলোর (কুরবানীর পশুর) রক্ত ও গোশত আল্লাহর নিকট পৌছায় না কিন্তু পৌছায় তোমাদের তাকওয়া। (হজ্জ : ৩৭)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে বলছেন, কুরবানীর পশুর যে রক্ত ঝরে এবং যে গোশত হয়, ঐ রক্ত ও গোশত তাঁর নিকট পৌছায় না। অর্থাৎ ঐ রক্ত ও গোশত দেখে তিনি খুশি হন না। তাঁর কাছে পৌছায় অর্থাৎ তিনি খুশি হন, যদি ঐ কুরবানীর মাধ্যমে তাকওয়ার যে শিক্ষা তিনি দিতে চেয়েছেন সেই শিক্ষা অর্জিত হয়। আর তাকওয়ার সে শিক্ষাটি হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বা আল্লাহর আদেশ মানার লক্ষ্যে জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটিও কুরবানী করার মানসিকতা তৈরির শিক্ষা।

সুধী পাঠক, কুরআন ও সুন্নাহ যাচাই করলে এভাবে দেখা যায় কুরআন অধ্যায়ন, ঈমান, নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ, কুরবানী, তাস্‌বিহ-তাহলীল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ থেকে আল্লাহ্ অনেক অপূর্ব শিক্ষা মানুষকে দিতে চেয়েছেন বা তার মাধ্যমে তিনি মানুষের মানসিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী গঠন করতে চেয়েছেন। নামাজের অপূর্ব শিক্ষাগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে' নামক বইটিতে।

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, একটি চির সত্য বিষয় হচ্ছে, যে কাজের মাধ্যমে কোন শিক্ষা দিতে চাওয়া হয় বা যে বিষয়টি প্রণয়ন করা হয়েছে কোন কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্যে বা যে কাজের মাধ্যমে মানুষের মন-মানসিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে গঠন করতে চাওয়া হয়, সে কাজ বা বিষয়টি সব সময় (Universally) পাথেয়মূলক কাজ বা বিষয় হয়। উদ্দেশ্যমূলক কাজ বা বিষয় হয় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাহলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, মানুষের জীবনের উপাসনা বিভাগের কাজ বা বিষয়গুলো অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান অর্জন, ঈমান, নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ, কুরবানী, তাস্‌বিহ-তাহলীল ইত্যাদি মানুষ সৃষ্টির পাথেয়মূলক কাজ বা বিষয়, উদ্দেশ্যমূলক কাজ বা বিষয় নয়।

তথ্য-৫

সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন—

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ -

অর্থ : আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্যে।

ব্যাখ্যা : কুরআনের যে সকল আয়াতের অসতর্ক ব্যাখ্যা, এক সময়ের সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ মুসলমান জাতিকে বর্তমানে একটা অধঃপতিত জাতিতে পরিণত করেছে তার মধ্যে এটি অন্যতম প্রধান একটি। আয়াতটির যে দুটো অসতর্ক ব্যাখ্যা মুসলমান জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং সে অনুযায়ী আমলও করা হচ্ছে। তা হচ্ছে—

ক. বেশির ভাগ মুসলমান মনে করেন বা মেনে নিয়েছেন যে, 'ইবাদাত' শব্দটি দিয়ে বুঝায় নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী, তাস্‌বিহ-তাহলীল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজগুলো। তারা আরো মনে করেন 'ইবাদাত করার' অর্থ হচ্ছে ঐ কাজগুলোর শুধু অনুষ্ঠানটি করা। ইবাদাত শব্দ সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণকারী মুসলমানরা এ আয়াতটি থেকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ধরে নিয়েছেন ঐ উপাসনামূলক কাজগুলোর অনুষ্ঠানটি শুধু করা। আর তাই দেখা যায়, কুরআন ও সুন্নাহ 'ন্যায় কাজ বা অন্যায় কাজ' (معروف এবং نهى) বিভাগে যে কাজগুলো উল্লেখ করেছে, সেগুলো করার দিকে এবং উপাসনামূলক কাজগুলো থেকে আল্লাহ্ যে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, সে

শিক্ষাগুলো জানা, গ্রহণ করা ও তার ওপর আমল করার দিকে, তাদের খেয়াল খুবই কম।

আলোচ্য আয়াতটির এ অর্থ ও ব্যাখ্যা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ, আয়াতটির এ অর্থ ও ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচনাকৃত আল-কুরআনের সকল আয়াতের বক্তব্যের হয় প্রত্যক্ষ না হয় পরোক্ষভাবে বিরুদ্ধ।

খ. আয়াতটির দ্বিতীয় যে অর্থ মুসলমান সমাজে চালু আছে তা হচ্ছে 'আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্যে'।

আয়াতটির এ অর্থে لِيَعْبُدُوْنَ শব্দের সঠিক অর্থটিই করা হয়েছে। কারণ, ঐ শব্দটি এসেছে আরবী عبد শব্দ থেকে। যার অর্থ হচ্ছে 'দাস'। কিন্তু আয়াতটির তরজমায় দাসত্ব শব্দটির একটু ব্যাখ্যা না দিয়ে সরাসরি এভাবে লিখলে বা বললে যে অসুবিধা হয়, তা হচ্ছে ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলিসহ উপাসনা বিভাগের কাজগুলিও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে এসে যায়। কারণ উপাসনা বিভাগের কাজগুলিও তো (ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি) আল্লাহর দাসত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাই আয়াতটির তরজমা এভাবে করলেও তা পূর্বে আলোচনাকৃত আল-কুরআনের সব ক'টি তথ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। সুতরাং আয়াতটির এভাবে তরজমা করা বা লেখাও ঠিক নয়।

তাই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আল-কুরআনের অন্য সকল আয়াতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং لِيَعْبُدُوْنَ শব্দের সঠিক অর্থ ধরে আয়াতটির তরজমা করতে হলে তা হবে 'আমি জীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার দাসত্ব হয় এমনভাবে (বা শুধুমাত্র আমার দাসত্বের শর্ত পূরণ করে) তাদের জীবন পরিচালনা করার জন্যে।

এই তরজমাটি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী অন্যান্য আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হবে। কারণ, একটি কাজ কোন সত্তার দাসত্ব হিসেবে গণ্য হতে হলে সে কাজকে অবশ্যই-[redacted] শর্তগুলো পূরণ করতে হবে বা হয়–

১. সত্তার সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কাজটি করা।

২. সত্তা যে উদ্দেশ্যে কাজটি সৃষ্টি বা প্রণয়ন করেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধনকেও

সর্বক্ষণ সামনে রাখা। অর্থাৎ কাজটি করার সময় সব সময় খেয়াল রাখতে হবে সত্তা যে উদ্দেশ্যে কাজটি প্রণয়ন করেছেন, তা সাধন হচ্ছে কিনা বা হবে কিনা।

৩. সত্তার বলে দেয়া পাথেয়কে উদ্দেশ্য মনে না করা। অর্থাৎ পাথেয়কে বা পাথেয়গুলোকে উদ্দেশ্য সাধনের বিভিন্ন উপায় বা মাধ্যম মনে করা এবং সেভাবে ঐগুলোকে পালন করা।

৪. সত্তার বলে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী কাজটি করতে হবে।

৫. কাজটি ব্যাপক হলে–

ক. মৌলিকের একটিও বাদ না দেয়া।

খ. গুরুত্ব অনুযায়ী কাজগুলো করা।

৬. কাজটি আনুষ্ঠানিক হলে–

ক. প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে সত্তার দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নেয়া।

খ. সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করা।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কোন কাজ আল্লাহর ইবাদাত হওয়ার জন্যে অবশ্য পূরণীয় শর্তসমূহ' নামক বইটিতে।

এই শর্তগুলো আল্লাহ, শয়তান, নফস, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, নেতা, মুরুব্বি, অফিসের বস ইত্যাদি যে কারো দেয়া হতে পারে। আর যে সত্তার দেয়া শর্ত পূরণ করা হবে কাজটি সে সত্তার দাসত্ব হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ শর্তগুলো আল্লাহর দেয়া বা আল্লাহর পছন্দ মত হলে তা আল্লাহর দাসত্ব হবে। আবার তা শয়তানের দেয়া বা শয়তানের পছন্দ মতো হলে তা শয়তানের দাসত্ব হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটি কাজ কোন্ সত্তার দাসত্ব হিসেবে গণ্য হবে, তা নির্ণয় করার জন্যে কাজটি করার সময় কোন্ সত্তার ঠিক করে দেয়া 'উদ্দেশ্য' সাধন করা হচ্ছে, সেটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের জীবন পরিচালনা করা বা জীবন ব্যবহার করা একটা ব্যাপক কাজ। তাই এই 'জীবন পরিচালনা' কোন্ সত্তার দাসত্ব হিসেবে গণ্য হবে, তাও নির্ভর করবে যে সকল বিষয়ের উপর তার প্রধান একটি হচ্ছে, জীবন পরিচালনা করার সময় কোন্ সত্তার নির্ণয় করে দেয়া বিষয়কে বা বিষয়গুলোকে জীবন সৃষ্টির 'উদ্দেশ্য' ধরে নিয়ে জীবন পরিচালনা করা হচ্ছে। মানুষের জীবন

পরিচালনা যদি মহান আল্লাহর দাসত্ব হিসেবে গণ্য হতে হয়, তবে যে 'উদ্দেশ্যে' বা 'যে উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলো করার জন্যে' আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধন বা সে উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলো সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা, তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হবে। যদি তা না হয়, তবে সে জীবন পরিচালনা অবশ্যই আল্লাহর দাসত্ব না হয়ে অন্য কোন সত্তার দাসত্ব হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আলোচ্য আয়াতটির তরজমা যদি আমি জীন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি শুধু আমার দাসত্ব হয় এমনভাবে (বা শুধু আমার দাসত্বের শর্তপূরণ করে) জীবন পরিচালনার জন্যে' করা হয়, তবে তা যেমন لِيَعْبُدُوْنَ শব্দের সঠিক অর্থবোধক হয় তেমনই তা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য কোন আয়াতের বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় না।

আর মানুষের পুরো জীবন অর্থাৎ পুরো জীবন পরিচালনা আল্লাহর দাসত্ব হিসেবে গণ্য হতে বা গণ্য করাতে হলে (দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের কামিয়াবির জন্যে যা অবশ্যই দরকার), যে সকল শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে, তা হচ্ছে–

১. জীবন পরিচালনার সময় অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি কাজ করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সব সময় সামনে রাখতে হবে।

২. জীবন পরিচালনার সকল সময় খেয়াল রাখতে হবে তা যেন আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য (কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা) বাস্তবায়নের দিকে কোন না কোনভাবে ভূমিকা রাখতে পারে বা রাখে।

৩. উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলো বাদে জীবনের আর সকল কাজকে আল্লাহ মানুষের জীবনের পাথেয়মূলক কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাই ঐ কাজগুলো করার সময় সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে, সেগুলো যেন জীবনের উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলো করার পথে মানুষকে গঠন বা সাহায্য করার ব্যাপারে মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, স্বাস্থ্যগত, বৈষয়িক ইত্যাদি কোন না কোন ভাবে ভূমিকা রাখে।

৪. জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর জানানো এবং রাসূল (সঃ)-এর দেখানো পদ্ধতিতে করা।

৫. জীবন পরিচালনার সময় কুরআন ও সুন্নাহ ঘোষণাকৃত মৌলিক কাজগুলোর একটিও বাদ না দেয়া এবং গুরুত্ব অনুযায়ী কাজগুলো আগে বা পরে করা।

৬. জীবনের আল্লাহ ঘোষিত আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলো (ঈমান আনা, নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ ও কুরবানী) নিষ্ঠার সঙ্গে করে প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে

আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে এবং অ-আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলো (কুরআন তেলাওয়াত, তাস্‌বিহ-তাহলীল) থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনকে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে গঠন করে সে শিক্ষাকে জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কাজে লাগানো।

সুধী পাঠক, তাহলে চিন্তা করে দেখুন, একটি মাত্র শব্দের (عبد ← ليعبدون) অসতর্ক ব্যাখ্যা ও বুঝ বিশ্ব মুসলমানদের আজ কোথায় নিয়ে গেছে। এই অসতর্ক ব্যাখ্যাটির জন্যে তারা অধিকাংশই আজ মনে করছে বা মেনে নিয়েছে, তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী, তাস্‌বিহ-তাহলীল ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজগুলো করার জন্যে। আর ন্যায়-অন্যায় কাজগুলো, সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তেমন বা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই তো দেখা যায়–

- ❑ উপাসনামূলক আমলগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে করছেন এমন মুসলমানের অধিকাংশেরও ন্যায় ও অন্যায় (معروف ও نهى) বিভাগের কাজগুলো করার প্রতি তেমন বা মোটেই খেয়াল নেই।
- ❑ মুসলিম সমাজ বা দেশগুলোতে ন্যায় কাজের দারুণ অভাব কিন্তু অন্যায় কাজে ভরপুর।

ভেবে দেখুন, একটিমাত্র শব্দের অসতর্ক তরজমা, ব্যাখ্যা বা বুঝ কিভাবে একটি শ্রেষ্ঠ জাতিকে অধঃপতিত জাতিতে পরিণত করেছে বা কিভাবে তাদের বেহেশত থেকে দোযখের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

তথ্য-৬

وَ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الاَرْضِ ..... (আন-আম : ১৬৫)

اِنِّى جَاعِلٌ فِى الاَرْضِ خَلِيْفَةً ...... (বাকারা : ৩০)

তাফসীর গ্রন্থসমূহে প্রথম আয়াতটির তরজমা করা হয়েছে 'তিনিই তোমাদের (মানুষদের) পৃথিবীতে খলিফা করে পাঠিয়েছেন' এবং দ্বিতীয়টির তরজমা করা হয়েছে, 'আমি (আল্লাহ) পৃথিবীতে খলিফা পাঠাতে যাচ্ছি'। আর এ তরজমার ব্যাখ্যা থেকে বলা হয়েছে, 'খলিফার দায়িত্ব পালন করার জন্যে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন'।

আয়াত দু'টির তরজমা এভাবে করলে খলিফার করণীয় সকল কাজই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে এসে যায়। উপাসনামূলক (নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি) কাজগুলোও তো খলিফার কাজ। সুতরাং ঐ কাজগুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে এসে যায়। এটা পূর্ব উল্লেখিত কুরআনের ১, ২, ৩, ও ৪ নং তথ্যের বিরুদ্ধ কথা। তাই আয়াত দু'টির এভাবে উপস্থাপনকৃত তরজমা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

খলিফা অর্থ হচ্ছে প্রতিনিধি। প্রতিনিধির কাজই হচ্ছে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বলে দেয়া অবশ্য পূরণীয় সকল শর্ত পূরণ করে তার জীবন তথা প্রতিনিধিত্ব পরিচালনা করা। প্রতিনিধিত্বের অবশ্য পূরণীয় শর্তগুলো আর দাসত্বের অবশ্য পূরণীয় শর্তগুলো একই। অর্থাৎ ৫ নং তথ্যে দাসত্বের যে শর্তগুলো উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিনিধিত্বের শর্তগুলো হবে হুবহু ঐ রকম। শুধু সেখানে 'দাস ও দাসত্বের' স্থানে 'প্রতিনিধি ও প্রতিনিধিত্ব' পড়লেই হবে।

তাহলে প্রথম আয়াতটির সঠিক তরজমা হবে, 'তিনিই তাঁর প্রতিনিধিত্ব হয় এমনভাবে বা তাঁর প্রতিনিধির শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনার জন্যে তোমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন'। এবং দ্বিতীয় আয়াতটির সঠিক তরজমা হবে, 'আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধিত্ব হয় এমনভাবে অর্থাৎ আমার প্রতিনিধির শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করবে, এমন সৃষ্টি পাঠাতে যাচ্ছি'। আর কুরআনের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য আয়াতগুলোর বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই আয়াত দু'টির চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হবে-'আল্লাহ মানুষকে ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে খলিফা হিসেবে জীবন পরিচালনার জন্যে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন'।

তথ্য-৭

এ পর্যায়ে এসে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে–

ক. আল্লাহর মত অনুযায়ী ন্যায়-অন্যায় কাজগুলো কি কি এবং তা জানার উপায় কি?

খ. ঐ ন্যায়-অন্যায় কাজগুলোর দু'চারটি করলে চলবে? না সব ক'টি করতে হবে?

প্রশ্ন দুটো মানুষের জীবনের জন্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই তার উত্তর অবশ্যই আল-কুরআনে থাকবে। কারণ মহান আল্লাহ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি মানুষের জীবনের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয় আল-কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। (নাহল : ৮৯)

আল্লাহর দৃষ্টিতে ন্যায়-অন্যায় কাজগুলো কি কি তা জানার উপায়

আল্লাহর দৃষ্টিতে ন্যায়-অন্যায় (معروف ও نهى) বিভাগের কাজগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রথম স্তরের মৌলিক তার সবগুলো তিনি আল-কুরআনে উল্লেখ করে রেখেছেন। তাই কেউ যদি জানতে চায়, তবে আল-কুরআন অর্থসহ বুঝে পড়লেই তা নির্ভুলভাবে জানতে পারবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা যাতে কুরআনের ঐ বক্তব্যগুলো সহজে জানতে না পারে, সে জন্যে ইবলিশ শয়তান

নানাভাবে ধোঁকাবাজি খাটিয়েছে এবং অধিকাংশ মুসলমান ইবলিশের সেই ধোঁকাবাজিমূলক কথাগুলোকে ইসলামের কথা মনে করে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তার ওপর আমলও করে যাচ্ছে। ইবলিশের সেই ধোঁকাবাজিমূলক কথাগুলো কি কি, তা জানতে পারবেন প্রকাশিত নিম্নের বইগুলি থেকে—

১. 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মু'মিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ'।

২. 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি হবে না?'

৩. 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?'

ন্যায়—অন্যায় কাজগুলোর দু'চারটা করলে চলবে না সবগুলো করতে হবে

ক.

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ -

অর্থ : তোমরা কি এই কিতাবের কিছু বিশ্বাস কর আর কিছু অবিশ্বাস কর? যারা এরকম করবে, দুনিয়ার জীবনে তাদের দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কোন বদলা নেই। আর কেয়ামতের দিন তাদের পৌঁছে দেয়া হবে কঠোরতম শাস্তির দিকে। (বাকারা : ৮৫-৮৬)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে যারা কুরআনের বক্তব্য বিষয়গুলোর কিছু বিশ্বাস করবে আর কিছু অবিশ্বাস করবে, তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কি অবস্থা হবে, তা বর্ণনা করেছেন। কোন ব্যক্তি যদি কোন বিষয় মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে তবে তা তার কর্মকাণ্ডে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। তাই আল্লাহ এখানে বলছেন, যারা কুরআনের নির্দেশগুলোর কিছু বিশ্বাস ও পালন করবে আর কিছু বিশ্বাস ও পালন করবে না, দুনিয়ায় তাদের হবে দুর্গতি আর লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে হবে চরম শাস্তি।

খ.

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لا
الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ط وَ اَمْلٰى لَهُمْ - ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ
كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الاَمْرِ ج وَاللّٰهُ يَعْلَمُ
اِسْرَارَهُمْ - فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وَ جُوْهَهُمْ وَ
اَدْبَارَهُمْ - ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهَ وَ كَرِهُوْا رِضْوَانَهُ
فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ -

অর্থ : হেদায়েত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যারা তা হতে ফিরে যায়, তাদের জন্যে শয়তান ঐরূপ আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা তাদের জন্যে দীর্ঘ করে দিয়েছে। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহর নাযিল করা বিষয়কে (কিতাব বা দীনকে) অস্বীকারকারীদের বলে, কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করব। আল্লাহ্ তাদের এই গোপন কথা ভালো করেই জানেন। তাহলে তখন কি হবে যখন ফেরেশতাগণ তাদের রুহগুলোকে কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর মারতে মারতে নিয়ে যাবে। এটাতো এ কারণেই যে, তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে অপছন্দ করেছে। এ কারণে তিনি তাদের সকল আমল বিনষ্ট (নিষ্ফল) করে দিবেন। (মুহাম্মদ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ্ উপস্থাপন করেছেন, কিতাবের মাধ্যমে হেদায়েত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তার থেকে ফিরে যায়, তাদের কিছু অবস্থা। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই ফিরে যাওয়া বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন, তা বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, জীবনের কিছু কিছু ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করা আর কিছু কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ) কথা অনুসরণ করা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এই আয়াত ক'টিতে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে–

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

২. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে মৃত্যুকালে ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করে জর্জরিত করবে।

৩. ঐ ধরনের আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।

৪. ঐ আচরণের জন্যে তাদের সকল আমল বিনষ্ট বা নিষ্ফল হয়ে যাবে।

এই আয়াত ক'টির তথ্যগুলো থেকেও স্পষ্ট বুঝা যায়, আল্লাহর দেয়া কিতাবের 'কিছু' অনুসরণ করলে আর 'কিছু' অনুসরণ না করলে পুরো জীবনটাই দুনিয়া ও পরকালে বিফলে যাবে।

সূরা বাকারা ও সূরা মুহাম্মাদের উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে তাহলে স্পষ্ট বুঝা যায়, আল-কুরআনে উল্লেখিত মূল বিষয়ের কিছু মানলে ও অনুসরণ করলে এবং কিছু না মানলে ও অনুসরণ না করলে মানুষের দুনিয়া ও পরকালের জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ আল-কুরআনে উল্লেখিত মূল বিষয়ের সবগুলেকে প্রত্যেক মানুষের অবশ্যই মানতে হবে। আল-কুরআনে উল্লেখ আছে, মানুষের জীবনের প্রত্যেক বিভাগের (ন্যায়-অন্যায় কাজ, উপাসনামূলক কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ, পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ) প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়। আর মানুষের জীবনের ঐ সকল বিভাগের দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়গুলোর কিছু আছে আল-কুরআনে আর সব আছে আল হাদীসে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো এবং কামেল হওয়ার ও বেহেশত পাওয়ার সর্বনিম্ন যোগ্যতা কি, তা জানা ও বুঝার সহজতম উপায়' নামক বইটিতে।

তাহলে আল কুরআনের এ তথ্য থেকে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, কুরআনে উল্লেখিত মূল ন্যায়-অন্যায় কাজগুলোর সবগুলো বাস্তবায়ন ও প্রতিরোধ করতে হবে।

কুরআনের কিছু মানা আর কিছু না মানা, বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার একটি প্রধান কারণ। আর তাদের এই ধরনের কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে আল কুরআনের মাধ্যমে ঘোষণাকৃত দুনিয়ার ফলাফল যখন কড়ায়-গণ্ডায় সত্য হচ্ছে, তখন আখেরাতের ফলাফলও যে সত্য হবে, সে ব্যাপারে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।

এ পর্যায়ে এসে আলোচ্য আয়াত ক'টির বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসা আর একটা বিষয় মুসলমানদের ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার। বিষয়টা হচ্ছে, আল্লাহ এখানে বলেছেন কুরআনে বর্ণিত মূল বিষয়গুলির একটিও না মানলে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অনুসরণ না করলে তাদের দুনিয়ার ও আখেরাতের জীবন ব্যর্থ হবে। কুরআনে উল্লেখ আছে, প্রথম স্তরের সকল মৌলিক উদ্দেশ্যমূলক এবং পাথেয়মূলক কাজ। প্রশ্ন হচ্ছে, মৌলিক উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলোর একটিও না করলে জীবন ব্যর্থ হবে তা না হয় বুঝা গেল কিন্তু মৌলিক পাথেয়মূলক কাজগুলোর একটিও না করলে জীবন ব্যর্থ হবে কেন? বা তা হওয়ার কারণ কি?

গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে, পাথেয়মূলক বিষয়গুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক (মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, স্বাস্থ্য ও বৈষয়িক) দিক দিয়ে, উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলো সঠিকভাবে করার উপযোগী বা যোগ্য করে গড়ে তোলা। তাই কেউ যদি একটিও মৌলিক পাথেয়মূলক কাজ না করে তবে তার মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলোকে সঠিকভাবে করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতার মধ্যে একটি মৌলিক অভাব বা ত্রুটি রয়ে যাবে। ফলে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করতে সফল হবে না। তাই তার সকল কর্মকাণ্ড অর্থাৎ দুনিয়া ও পরকালের উভয় জীবন ব্যর্থ হবে।

সুধী পাঠক,

তাহলে আল-কুরআনের উল্লেখিত তথ্যগুলো পর্যালোচনার পর নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, **'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা'**। আর মানুষের জীবনের অন্য বিভাগের কাজগুলো হচ্ছে, ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয়। অর্থাৎ ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সহায়ক হয় এমনভাবে মানুষের মন, বুদ্ধিবৃত্তি, শরীর-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হাদীসের তথ্যসমূহ

চলুন, এবার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় সম্বন্ধে হাদীসের তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করা যাক—

তথ্য-১

وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَ كَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَّمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرُ فِىْ سَاعَةٌ قَطُّ ـ

অর্থ : জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ জিব্রাইল (আঃ)কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক অমুক শহরকে উহার অধিবাসী সমেত উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে রব, উহাদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে যে মুহূর্তের জন্যেও তোমার নাফরমানী করে নাই। রাসূল (সঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, তার ও উহাদের সকলের উপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যে তার চেহারা মলিন হয় নাই। (বায়হাকী, শো'য়াবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, শহরটিকে উল্টিয়ে দেয়ার আদেশ পাওয়ার পর জিব্রাইল (আঃ) একটি লোকের শাস্তি কেন হবে তা বুঝার জন্যে আল্লাহকে বলেছিলেন, 'সে ব্যক্তি তো মুহূর্তের জন্যেও তাঁর নাফরমানী করে নাই'। জিব্রাইল (আঃ) এর ঐ কথার উত্তরে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির শাস্তি হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলেছেন, 'সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যেও তার চেহারা মলিন হয় না'।

হাদীসটিতে উল্লেখিত জিব্রাইল (আঃ) ও মহান আল্লাহর কথা থেকে বুঝা যায়, লোকটি ঈমান আনা, নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ, কুরবানী, তাস্বীহ-তাহলীল অর্থাৎ সকল উপাসনামূলক ইবাদাত বা কাজ, শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক ইবাদাত বা কাজসমূহ, পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক ইবাদাত বা কাজসমূহ করছিলো। কিন্তু ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ মূলক কাজসমূহের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করার জন্যে তার ঐ সকল কাজ আল্লাহ গ্রহণ করেননি বা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। এর কারণ হচ্ছে, 'ন্যায় ও অন্যায়' বিভাগের কাজসমূহ অর্থাৎ ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আর জীবনের অন্য বিভাগের কাজসমূহ অর্থাৎ উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিভাগের কাজসমূহ হচ্ছে, মানুষ সৃষ্টির পাথেয়। অর্থাৎ উপাসনা বিভাগের কাজগুলো করে তার থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে মন ও বুদ্ধিবৃত্তিকে, শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ করে শরীর-স্বাস্থ্যকে এবং পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজগুলো (সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি) করে পরিবেশ-পরিস্থিতিকে এমনভাবে গঠন করতে হবে যেন তা কুরআনে বর্ণিত ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো করার ব্যাপারে অর্থাৎ ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হওয়ারসহ যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে। কেউ যদি ঐ পাথেয় বিভাগসমূহের কাজগুলো এমনভাবে করে যে, তার মাধ্যমে মন-বুদ্ধিবৃত্তি, শরীর-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতি এমনভাবে গঠিত হল যা কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার ব্যাপারে, ইচ্ছাকৃতভাবে বা কোন কারণ ছাড়া, কোনই ভূমিকা রাখল না বা রাখতে সক্ষম হল না, তবে ঐ কাজসমূহ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য বা কবুল হবে না।

আলোচ্য হাদীসটিতে উল্লেখিত লোকটি পাথেয় বিভাগের সকল কাজগুলো করেছে কিন্তু তা এমনভাবে করেছে (যেমন উপাসনাগুলোর শুধু অনুষ্ঠান করা কিন্তু তা থেকে

শিক্ষা না নেয়া) যে সেগুলো তার মন, বুদ্ধিবৃত্তি, শরীর-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ পরিস্থিতিকে ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার উপযোগী করে মোটেই গড়ে তুলতে পারেনি বা গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, সে যদি ঐভাবে সব কিছু গড়ে তুলতো তবে চতুর্দিকে অন্যায়-পাপাচার হতে দেখে কোন কারণে সেগুলোকে শক্তি দিয়ে বা কথা দিয়ে প্রতিরোধ করতে না পারলেও মনে মনে সে ঐ কাজগুলোকে অবশ্যই ঘৃণা করত। অর্থাৎ তার ভ্রূকুটি অবশ্যই হত। তাই মহান আল্লাহ লোকটির জীবনের ঐ সকল কর্মকাণ্ড ব্যর্থ করে দিয়ে অর্থাৎ কবুল না করে তাকে শাস্তি দিলেন বা দিতে বললেন।

তথ্য-২

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدْ خُدْرِىْ (رضى) عَنْ رَسُوْ اللّٰهِ (ص) قَالَ مَنْ رَّاى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَ ذٰلِكَ اَضْعَفُ الاِيْمَانِ ـ

অর্থ : আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে বন্ধ করে। যদি ঐ ক্ষমতা না থাকে তবে সে যেন নিজ জিহ্বা দ্বারা তার প্রতিবাদ করে। আর যদি তার ঐ ক্ষমতাও না থাকে সে যেন নিজের অন্তরে তা ঘৃণা করে। আর ইহা ঈমানের দুর্বলতম স্তর (অর্থাৎ এর নিচে কোন ঈমান নেই)। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রাসূল (সঃ) বলেছেন, অন্যায় কাজ হতে দেখলে প্রত্যেক ঈমানদারের তা শক্তি দিয়ে বন্ধ করতে হবে। কোন কারণে তা না পারা গেলে সকলকে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। আর কোন কারণে তাও সম্ভব না হলে অন্তরে ঐ অন্যায় কাজকে ঘৃণা করতে হবে। যে ব্যক্তি এই ঘৃণাও না করবে, তার ঈমান নাই বা সে ঈমান আনে নাই।

হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, অন্যায়কে প্রতিরোধ করা অর্থাৎ ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক কাজ এবং ঈমান আনাসহ জীবনের অন্য সকল বিভাগের কাজ, মানুষ সৃষ্টির পাথেয়মূলক কাজ। কারণ 'ঈমান আনা' এই আনুষ্ঠানিক উপাসনামূলক ইবাদাতটির অর্থ হচ্ছে—

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

এই কালেমাটি মুখে উচ্চারণ করা, তার অর্থ ব্যাখ্যাসহ বুঝা, সে অর্থ ও ব্যাখ্যাকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা বা গ্রহণ করা (এবং বাস্তব কাজের মাধ্যমে সে বিশ্বাসের প্রমাণ দেখান)। কালেমাটির ব্যাখ্যা হল, জীবনের সকল বিভাগের কাজগুলোকে, তাদের মধ্যে

পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রেখে, আল্লাহ যেভাবে করতে বলেছেন এবং রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) যেভাবে তা দেখিয়ে দিয়েছেন সেভাবে করা। কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা কালে দেখা যায়, উপাসনা বিভাগের কাজসমূহ (কুরআনের জ্ঞান অর্জন, নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ, কুরবানী ও তাসবীহ-তাহলীল) করার মাধ্যমে আল্লাহ এমন কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, যা মন ও বুদ্ধিবৃত্তিকে এমনভাবে গঠন করে যেন তা মানুষকে ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার ব্যাপারে আগ্রহান্বিত করাসহ বাস্তবে সে ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সহায়তা করে। তদ্রূপ দেখা যায়, শরীর-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজসমূহও আল্লাহ ও রাসূল এমনভাবে করতে বলেছেন যেন তার মাধ্যমে মানুষের শরীর ও পরিবেশ-পরিস্থিতি এমনভাবে গঠিত হয় যে, তাও ঐ ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো করার ব্যাপারে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে।

তাই কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ঈমানের দাবিই হচ্ছে জীবনের অন্য সকল বিভাগের কাজগুলো করে মন, বুদ্ধিবৃত্তি, শরীর-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতি এমনভাবে গঠন করা যেন তা ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয় এবং সে ব্যাপারে বাস্তবে যথাযথ ভূমিকাও রাখে। সুতরাং ঈমানের দাবিদার কোন ব্যক্তিকে যদি দেখা যায় যে, জীবনের অন্য সকল বিভাগের কাজ করছে কিন্তু ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই এবং কোন কারণ ছাড়াই সে ব্যাপারে বাস্তবে তার কোন ভূমিকাও নেই, তবে নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তি ঈমান আনা আমলটির অনুষ্ঠানটি করলেও আসলে সে অন্তর দিয়ে তা বিশ্বাস করে নাই। আর তাই আলোচ্য হাদীসটিতে যে ব্যক্তির মনে অন্যায় কাজ সম্বন্ধে ঘৃণাও নাই তার ঈমান নাই বা সে ব্যক্তি ঈমান আনে নাই বলে রাসূল (সঃ) জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَ جَارُهُ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهِ -

رواه البيهقى فى شعب الايمان

অর্থ : ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ)কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে উদর ভরে খায় কিন্তু তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে। (বায়হাকী, শো'আবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা : প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট ভরে খাওয়া ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে

একটা অন্যায় কাজ। তাই এ হাদীসটি থেকেও বুঝা যায়, 'ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক কাজ। আর 'ঈমান আনা' একটা পাথেয়মূলক কাজ। মনের থেকে ঈমান আনার একটি অর্থ হচ্ছে, মানসিকতা এমনভাবে গড়ে তোলা বা গড়ে উঠান যে, প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে কেউ যেন নিজে পেট ভরে না খায়। অর্থাৎ নিজে পেট ভরে খাওয়ার আগে প্রতিবেশী যাতে কিছু খেতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর তাই হাদীসটিতে রাসূল (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে পেট ভরে খায়, সে ঈমানদার নয়' অর্থাৎ সে প্রকৃতভাবে ঈমান আনে নাই।

তথ্য-৪

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَنَّ فَلاَنَةً تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَ صَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِىَ فِىْ النَّارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَانَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرَ قِلَّةُ صِيَامِهَا وَ صَدَقَتِهَا وَ صَلوتِهَا وَ انَّهَا تَصَدَّقُ بِالاَثْوَارِ مِنَ الاَقِطِ وَ لاَ تُؤْذِىْ بِلِسَاهَا حِبْرَانَهَا قَالَ هِىَ فِى الْجَنَّةِ -

رواه احمد وبيهقى فى شعب الايمان -

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক মহিলা নামাজ ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি (রাসূল সঃ) বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম রোজা রাখে, সদকা কম করে এবং নামাজও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হল পনিরের টুকরাবিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি (রাসূল সঃ) বললেন, সে জান্নাতী। (আহমদ ও বায়হাকী)।

ব্যাখ্যা : প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অন্যায় কাজ। হাদীসটি থেকেও তাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদি উপাসনামূলক কাজ হচ্ছে, মানুষের সৃষ্টির পাথেয়মূলক কাজ। অর্থাৎ ঐ কাজগুলোর অনুষ্ঠানটি আল্লাহ প্রণয়ন করেছেন বা করতে বলেছেন মানুষকে তার অনুষ্ঠান থেকে

শিক্ষা নিয়ে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলোকে নিষ্ঠার সঙ্গে করার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্যে। তাই হাদীসটিতে রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাজ, রোজা ও সদকা অনেক করে কিন্তু প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেয়, সে জাহান্নামী। কারণ, তার কার্যকলাপ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, উপাসনাগুলোর অনুষ্ঠানই শুধু সে করেছে। তা থেকে শিক্ষা নিয়ে মন-মানসিকতা আল্লাহ যেভাবে গড়তে বলেছেন, সেটা সে করেনি বা সেটা তার গড়ে উঠেনি। ফলে তার ঐ উপাসনামূলক কাজগুলো আল্লাহর নিকট কবুল হয় নাই বা হবে না। অর্থাৎ তার চূড়ান্ত অবস্থা হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক কাজ সে করেনি আর পাথেয়মূলক কাজ তার কবুল হয়নি। সুতরাং সে জাহান্নামী হবে। তাই এ ব্যক্তিকে রাসূল (সঃ) জাহান্নামী বলেছেন।

আর যে মহিলাটি উপাসনামূলক কাজগুলো (ফরজ, ওয়াজিব বাদ না দিয়ে) কম করেছে কিন্তু প্রতিবেশীকে সে মুখ দিয়ে কষ্ট দেয় না। সে উপাসনার অনুষ্ঠানটি কম করলেও তা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের মন-মানসিকতাকে সঠিকভাবে গঠন করেছে এবং উদ্দেশ্যমূলক কাজ সঠিকভাবে করার মাধ্যমে সে তার প্রমাণ দেখিয়েছে। তাই তার অল্প উপাসনাও আল্লাহর নিকট কবুল হয়েছে বা হবে এবং সে জান্নাতী হয়েছে বা হবে। আর তাই ঐ মহিলাকে রাসূল (সঃ) জান্নাতী বলেছেন।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, উপাসনামূলক ইবাদাতগুলো একেবারে না করলে (ফরজ-ওয়াজিব বাদ দিলে) করো মন ও বুদ্ধিবৃত্তি কখনোই এমনভাবে তৈরি হবে না, যাতে করে সে ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো আল্লাহ যেভাবে করতে বলেছেন, সেভাবে করতে পারবে। তাই তারও পুরো জীবন ব্যর্থ হবে। আর উপাসনামূলক কাজগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে যে যত বেশি করবে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে সে তার মন-মানসিকতাকে তত বেশি উপযোগী করে গঠন করতে পারবে। আর এর ফলস্বরূপ উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলো সে বেশি ভাল করে করতে পারবে। ফলে তার বেহেশতের দরজা (Grade) বেড়ে যাবে।

তথ্য-৫

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَدِرْهَمْ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَاتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَّ صِيَامٍ وَّ

زَكَاةٍ وَ يَاتِى قَدْ شَتَمَ هذا وَ قَذَفَ هذا وَ اَكَلَ مَالَ هَذه وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا وَ ضَرَبَ هذا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَ هذا مِنْ حَسَنَاتَهُ فَانْ فَنِيَتْ حَسَنَاتَهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْضَ وَ عَلَيْهِ اَخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ -

অর্থ : আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বললেন, তোমরা কি জান, সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হল সে, যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি সে যে, কিয়ামতের ময়দানে নামাজ, রোজা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোন মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কাহারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত (অন্যায়ভাবে) প্রবাহিত করেছে বা কাউকে (অন্যায়ভাবে) মেরেছে। অতঃপর তার নামাজ, যাকাত, রোজা ইত্যাদি নেক কাজগুলোকে বিনিময় হিসেবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত বা কষ্টপ্রাপ্ত লোকগুলোকে দেয়া হতে থাকবে। এভাবে তার সকল নেক কাজ বিনিময় দিয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দাবিদারদের পাপগুলো তার উপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : মানুষকে গালি দেয়া, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করা, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করা, কাউকে অন্যায়ভাবে মারা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায় কাজ। অর্থাৎ এগুলো ইসলামী জীবনের ন্যায়-অন্যায় বিভাগের কাজগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর নামাজ, যাকাত, রোজা, ইত্যাদি ইসলামী জীবনের উপাসনামূলক কাজ বা আমলের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসটিতে দেখা যাচ্ছে কেউ যদি দুনিয়ায় উল্লিখিত অন্যায় কাজগুলো করে তবে শেষ বিচারের দিন তার নামাজ, যাকাত, রোজা, ইত্যাদি সকল উপাসনামূলক আমল বিফলে যাবে এবং তাকে দোযখে যেতে হবে। তাই পূর্বোল্লিখিত অন্যান্য হাদীসের ন্যায় এ হাদীসটি থেকেও বুঝা যায়, 'ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক কাজ এবং উপাসনামূলক ইবাদাত বা কাজগুলো হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়মূলক কাজ।

সুধী পাঠক,

উল্লিখিত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, হাদীস অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, জীবনের ন্যায় ও অন্যায় বিভাগের কাজগুলো করা অর্থাৎ কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। আর জীবনের অন্য সকল বিভাগের কাজ হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির পাথেয়। আর রাসূল (সঃ)-এর কথা এরকমই হওয়ার কথা। কারণ–

- ❑ কোন কথা কুরআনে আছে কিন্তু রাসূল (সঃ) তা বলেননি বা করেননি এটি কোনক্রমেই হতে পারে না।
- ❑ আবার কুরআনের বিপরীত কথা বা কাজও রাসূল (সঃ) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আলোচনাকৃত কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির সকল রায়কে পর্যালোচনা করলে আমরা নিশ্চয়তা দিয়েই বলতে পারি যে, মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা'।

আর মানুষের জীবনের অন্য সকল বিভাগের (উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য, পরিবেশ-পরিস্থিতি) কাজগুলো হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের পাথেয়। অর্থাৎ তা হচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী করে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ।

উপাসনামূলক পাথেয়গুলোর গুরুত্ব

এ পর্যায়ে এসে যে প্রশ্নটি উঠতে পারে, তা হচ্ছে পাথেয়মূলক কাজগুলোর মধ্যে উপাসনা বিভাগের কাজগুলোকে অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান অর্জন, কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কাজগুলোকে এত গুরুত্ব কেন দেয়া হয়েছে? শ্রদ্ধেয় পাঠক, এ বিষয়ে পৃথিবীর কেউ নিশ্চয়ই দ্বিমত পোষণ করবে না যে, কোন ব্যাপক বা কঠিন কাজ করতে হলে প্রথমে সে কাজ করার উপযোগী জনশক্তি এবং পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি করার অবশ্যই দরকার। আর এর মধ্যে জনশক্তি গঠনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জনশক্তি গঠন বলতে তাদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং শারীরিক উভয় গঠনকে বুঝায়। তবে এ উভয়ের মধ্যে মানসিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক গঠনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ জনশক্তিই ব্যবহার করবে অন্যান্য উপায় উপকরণ। তারা যদি মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে উপযোগী না হয় তবে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য উপায় উপকরণ যাই থাকুক না কেন, সফলতা আসবে না। যেমন ধরুন কোন সরকার যদি তার দেশের নাগরিকদের রোগ ব্যাধির চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চায়, তবে প্রথমে তাকে ঐ কাজের উপযোগী ডাক্তার, নার্স এবং উপায় উপকরণ অর্থাৎ হাসপাতাল, ঔষধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এর মধ্যে জনশক্তির (ডাক্তার, নার্স ইত্যাদি) মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা যদি মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে উপযুক্ত না হয়, তবে তাদের সুস্বাস্থ্য এবং অন্য উপকরণ প্রচুর

থাকলেও তা সঠিকভাবে কাজে আসবে না। আর তাই মানুষের রোগব্যাধিরও চিকিৎসা হবে না।

আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ কাজ করতেও উপযুক্ত জনশক্তি ও উপায় উপকরণ দরকার। এর মধ্যে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে উপযুক্ত জনশক্তিই হচ্ছে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে উপযুক্ত জনশক্তি গঠন করার কোন ব্যবস্থা বা প্রোগ্রাম যদি আল্লাহর না থাকতো, তবে মহান আল্লাহ অবশ্যই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী সত্তা হতে পারতেন না। উপযুক্ত জনশক্তি তৈরির আল্লাহর সেই ব্যবস্থা হচ্ছে উপাসনাস্বরূপ কাজগুলো। ঐ কাজগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। কাজগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে করার মাধ্যমে তারা যদি সেই শিক্ষাগুলো মনেপ্রাণে গ্রহণ করে এবং তা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করার জন্যে তৈরি হয়ে যায়, তাহলেই শুধু তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে, অন্যথায় নয়। তাই ঐ কাজগুলোকে ইসলাম ফরজ (অবশ্য করণীয়) করেছে।

ঐ কাজগুলোর মধ্যে নামাজ থেকে আল্লাহ যে অপূর্ব শিক্ষাগুলো দিতে চেয়েছেন, তা আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে' নামক বইটিতে।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব

আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা পরিপূর্ণ হবে না যদি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব কতোটুকু তা নিয়ে কিছু আলোচনা করা না হয়।

কুরআন না জানলে একজন মানুষ নির্ভুলভাবে জানতে পারবে না কে তাকে সৃষ্টি করেছেন, কি উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, সৃষ্টির উদ্দেশ্যমূলক কাজগুলো কি কি, সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিকে দিয়ে গঠিত হওয়ার জন্যে কি কি কাজ করতে হবে, মৃত্যুর পর কি হবে ইত্যাদি জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। ফলে তার পক্ষে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধন করা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না বা হতে পারে না। তাই একজন মানুষের তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা অবশ্যই ১ নং বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা আমল হবে। আর কুরআন ও সুন্নাহ তাই আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জনকে একজন মুসলমান বা মানুষের ১ নং আমল হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মু'মিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ' নামক বইটিতে।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চলমান চিত্র (Flow Chart)

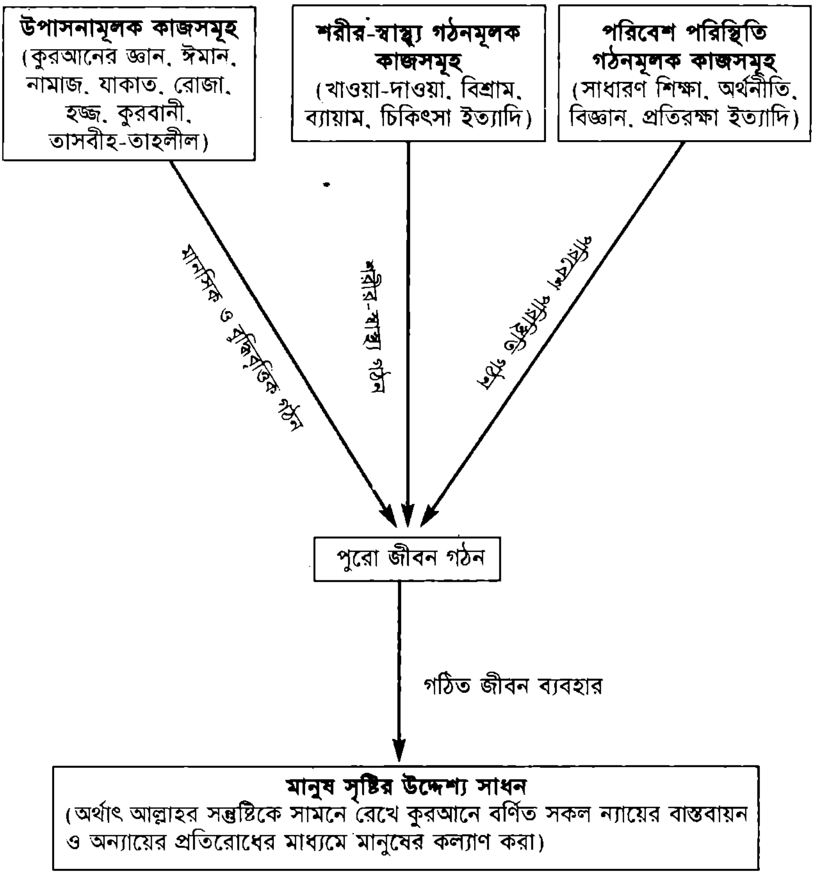

শেষ কথা

উদ্দেশ্যহীন চালক যেমন সারা জীবন গাড়ি চালালেও তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না তেমনই কোন মুসলমান আল্লাহ তাকে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তা ভালোভাবে না জেনে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনকেই তার জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য

হিসেবে ধরে না নিয়ে যদি তার জীবনের গাড়ি চালায়, তবে সেও তার পরম আকাঙ্ক্ষার গন্তব্যস্থল বেহেশতে পৌঁছাতে পারবে না। চাই সে প্রচলিত মতে যতো বড় নামাজী, রোজাদার, দানবীর, পরহেজগার, বুজুর্গ, পীর, মাওলানা, রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হোক না কেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার সর্বোত্তম উপায় কি, পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ তাও বলে দিয়েছেন। এটা 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি' শিরোনামের বইতে আলোচনা করেছি। আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তার মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, জীবনের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার তৌফিক দান করেন, কায়মনোবাক্যে এ দোয়া করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

সমাপ্ত

লেখকের বই সমূহ

বের হয়েছে—

❑ **পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী—**

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

২. নবী-রাসূল (সঃ) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি

৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?

৪. মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ

৫. কোন কাজ আল্লাহ্‌র ইবাদাত হওয়ার অবশ্য পূরণীয় শর্তসমূহ

৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?

৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ্ না সওয়াব?

৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোন্‌গুলো এবং কামেল হওয়ার ও বেহেশত পাওয়ার সর্বনিম্ন যোগ্যতা কি, তা জানা ও বুঝার সহজতম উপায়

৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ্ হবে কি হবে না

১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি- গানের সুর? না আবৃত্তির সুর?

১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি মানুষ রচিত আইন না কুরআনের আইন?

১২. কোন বিষয়ের সঠিকত্ব যাচাই ও বক্তব্য উপস্থাপনের নীতিমালায় কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ইসলামসম্মত ক্রমধারা (Flow Chart) (বর্ণনা ও চিত্রগত)

১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?

বের হওয়ার অপেক্ষায় –

❑ পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী –

১. ভোট না দেয়া বা ভুল স্থানে দেয়া কত বড় গুনাহ

২. কবীরা গুনাহ করলেও ঈমান থাকলে একদিন বেহেশতে যাওয়া যাবে কী?

৩. শাফায়াতের মাধ্যমে দোযখে যাওয়ার যোগ্য বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কী?

৪. তাকদীরের প্রকৃত তাৎপর্য

প্রাপ্তিস্থান

❑ আধুনিক প্রকাশনী

প্রধান কার্যালয় : ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন : ৭১১৫১৯১

শাখা অফিস:৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেট, বড় মগবাজার, ফোন : ৯৩৩৯৪৪২

❑ ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল

১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন : ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪

❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল, ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫

❑ আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার

ফোন : ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১৭৩৪৯০৮

❑ তাসনিয়া বই বিতান

৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা। মোবাঃ ০১৭২-০৪৩৫৪০

❑ ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন : ৫০৭৯২৯

❑ মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১-০৩০৭১৬

এছাড়াও ঢাকার অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে